শান্তনু চৌধুরী

কারা ওখানে?

‘তুই প্রিন্সিপালের নামে মিথ্যা আনছস? তুই ক এগিন ঠিক ন?’ ‘কে বইলছে, কে বইলছে’, ‘মুখোশ পরা, তবে কণ্ঠ চেনা চেনা লাগে।’ ‘আঁই কইছি না, যা কইছি সত্যি কইছি। হেরা চিৎকার করি উঠে। মারি ফালাইবু কয়।’

(গাড়ি ছুটে চলার শব্দ, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন)

‘হেরা কারা চিনছস নি?’

‘না মুখোশ পরা, তয় চেন চেনা লাগে।’ হাঁপাতে থাকে মেয়েটি।

গল্প

‘এরপর ক, কিছু অইত ন। এইতো ঢাকা গেলে বাঁচি যাইবি গই।’ ছেলেটি তাগাদা দেয়।

‘আমি শিক্ষকদের সম্মান করি। কিন্তু শিক্ষক অন্যায় করছে। আঁই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাই। বাঁচি আর মরি প্রতিশোধ লই ছাড়ুম।’

গাড়ির হর্ন। অ্যাম্বুলেস এর সাইরেন। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। আল্লাহ্ আল্লাহ্ ধ্বনি।

‘অন্যায়ের প্রতিবাদ করমু, সারাবাংলার মানুষরে কমু, প্রধানমন্ত্রীরে কমু।’

সন্ধ্যা নামার পর আজ একটু অবসর পেয়েছেন সুচতুর গোয়েন্দা কর্মকর্তা সন্তোষ পাহাড়ি ওরফে পাহাড়ি মামু। তার কথায় একটু পাহাড়ি টান রয়েছে বলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সবাই তাকে ‘মামু’ ডাকার গল্প করে এখন ডিপার্টমেন্টেও তিনি পাহাড়ি মামু। অবশ্য এই নামটি বেশ এনজয় করেন তিনি। অনেক সময় সাধারণ মানুষও তার খোঁজে এসে জানতে চান ‘পাহাড়ি মামু আছেনি?’ কয়েকদিন হলো প্রভালয়ে জোড়া খুন, রাস্তায় শিক্ষিকা খুনের মতো ঘটনার অভিযুক্তদের গ্রেফতার নিয়ে বেজায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। বসদের গুডবুকে থাকলে যা হয়। দম ফেলারও ফুরসত ছিল না। তাই ভুলে গিয়েছিলেন বন্ধু বা সহকর্মীদের নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার কথা। অনেক রাত পর্যন্ত অফিসের কাজের কারণে খুব ভোরে তেমন একটা ওঠা হয় না। কাজ থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তাই বিকেলের দিকে ঘাম ঝরাতে বেশ ভালোই লাগে। আজও খেলছিলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু কেন জানি মন বসছিল না। খেলার বিরতিতে মোবাইলে ফেসবুকে দেখলেন তাকে এক সহকর্মী একটি ভিডিও পাঠিয়েছেন ইনবক্সে। হেডফোন লাগিয়ে কয়েকবার শুনলেন। মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল। মেয়েটার বাঁচার আকুতির পাশাপাশি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার যে অদম্য আগ্রহ সেটি একদিকে স্বাগতও জানাতে ইচ্ছে হলো পাহাড়ির। র‍্যাকেট অন্যের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। মুঠোফোনে ফেসবুকে যে সহকর্মী ভিডিওটি পাঠিয়েছেন তাকে কল দিলেন।

‘এটা কিসের ভিডিও? কোথাকার?’

‘এটি ফেনীর। নুসরাত নামে এক শিক্ষার্থীর। অনলাইনগুলো দেখেন। সব সংবাদ পাবেন।’

‘কোন নুসরাত? ওই যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মাদরাসা অধ্যক্ষ কারাগারে।’

‘ইয়েস ডিয়ার।’

ফোন রেখেই ইন্টারনেটে মনোযোগ দিলেন। প্রতিদিন সারাদেশে কতো কতো অপরাধ ঘটছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোতে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের ঘটনার শেষ নেই। নুসরাতের ঘটনাও জেনেছিল অতটুকুই। এখন অনলাইনগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ফেনীর সোনাগাজীতে আলিম পরীক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে আগুন দেয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলো অভিযোগ লিখছে। তার মানে তারা এখনো নিশ্চিত নয় আগুনটা কীভাবে লাগল। কিন্তু এখন ফেসবুকে ভাইরাল যে ভিডিওটি সেটি যদি নুসরাতের কণ্ঠ হয়ে থাকে তাহলেতো ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট ভাবার কারণ রয়েছে। কিন্তু কণ্ঠ কী আসলে নুসরাতের? ঢাকার ধানমন্ডির হেডকোয়ার্টারে বার্তা পাঠালেন তিনি। যদিও তারা বিষয়টি অবগত। কিন্তু মুশকিল হলো হেড এখন দেশে নেই। এই লোকটি যেমন পাহাড়ির ওপর ভরসা করেন তেমনি তাদের হেডও কোন জাদুবলে যেন ঘটনার সূত্র ধরে অপরাধী ধরার নির্দেশ দিতে পারেন দ্রুত। পাহাড়ি মামু অনলাইনে গিয়ে ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদদৌলাকে নিয়ে প্রকাশিত পুরোনো ঘটনাগুলোর দিকে চোখ বুলান। যদিও এখনো তাকে ঘটনা তদন্তের কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এরপরও নিজের আগ্রহে তিনি এসব খুঁজতে থাকেন। অধ্যক্ষ সিরাজের ছবিটা দেখেন। ঠোঁট দেখে ফাঁসিতে ঝোলা রাজাকার মুজাহিদের কথা মনে পড়ে। দাঁড়ি কাদের মোল্লার মতো। তবে এখনই তাকে দোষী বলা যাবে না। সিরাজকে নিয়ে তথ্যগুলো টুকে রাখেন তিনি। অতীতে জামায়াতের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও এখন খোল পাল্টে ঢুকে পড়েছেন ক্ষমতাসীনদের দলে। স্থানীয় নেতাদের সাথে বেশ দহরম মহরম। অথচ এই লোককেই অনিয়ম ও ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছিল অন্য একটি মাদরাসা থেকে। কারাভোগ করেছেন তিন দফা। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা হয়েছে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। পাহাড়ি ভাবতে থাকেন। কলমের গোড়া মুখের মধ্যে নিয়ে ভাবেন। এই অভ্যাসের জন্য স্কুলে স্যারদের, বাড়িতে বাবা মায়ের কতনা পিটুনি খেয়েছেন। আহারে স্কুল কলেজ জীবন। হেসে দেন তিনি। মাথা থেকে নুসরাতের কণ্ঠস্বর বের করতে পারেন না। 'প্রতিশোধ নিমু' 'প্রতিশোধ নিমু'। পাহাড়ির এখনই তদন্তে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে অপরাধীদের দ্রুত ধরতে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। খুব আশা করেন হেড এই ঘটনায় তাকে সম্পৃক্ত করবেন।

দুই.

বাবা মাওলানা মুসা আর মা শিরিন আক্তারের একমাত্র মেয়ে নুসরাত। দুই ছেলে থাকলেও নুসরাত যেন মায়ের চোখে হারায়। একটু বেশি সাজগোছ করে বলে বাবার বকুনি তোলা থাকে সবসময়। নেকাব-বোরখা ছাড়া চলে না, কিন্তু চোখে কাজল দিয়ে টানা টানা চোখের আদল, ভ্রুগুলো প্লাক করা, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো আর বান্ধবীদের নিয়ে দুষ্টুমি করে বেড়ানোই শখ। সাজলে তাকে অসম্ভব রূপবতী মনে হয়। এই সৌন্দর্যের কারণে প্রতিদিন ভিতু প্রেমিকের দু'একটা চিঠি কানা-গলি পথ বেয়ে আসে তার কাছে। মজাই লাগে। মায়ের সাথে তার ভালোবাসা বেশি বলে সেগুলো জানায় মাকে। নিজেরও লেখালেখির শখ। জীবনের অনেক গোপন কথা লিখে রাখে ডায়রিতে। মাকে নিয়ে সে কবিতা লিখে, 'আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতো। আমি গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও, আমার মায়ের মতো।' নিজেকে সুন্দর রাখতে গিয়ে বা সুন্দরকে ভালোবাসতে গিয়ে একবার তার চোখে চুন মেরেছিল বখাটেরা। ডান চোখে কিছুটা কষ্ট এখনো হয়। মাস কয়েক আগে শাহাদাত নামে এক ছাত্র তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় সরাসরি। সেও সুন্দরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তার স্বপ্ন বড়। আলিম পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। নিজে একদিন বড় কিছু হবে। সেখানে আপাতত প্রেমের কোনো স্থান সে দিতে চায় না। সেটিই বুঝিয়ে বলেছিল শাহাদাতকে। শাহাদাত মানতে নারাজ। কিন্তু মাদরাসার শিক্ষক যাদের সে সম্মান করতো তারাও যে তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতো সেটাই যেন ভাবতে পারেনি। বিশেষ করে অধ্যক্ষ সিরাজ। নানা সময় তাকে কুপ্রস্তাব দিতো। আলাদাভাবে ক্লাস শেষে দেখা করতে বলতো। সে যেত না। কিন্তু সেদিন আর উপায় ছিল না। অফিস সহকারী নুরুল আমিনকে দিয়ে নুসরাতসহ তিন বান্ধবীকে ডেকে নিয়ে যায় দোতলার অফিস রুমে। কিন্তু ঢুকতে দেওয়া হয় শুধু নুসরাতকে। সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অধ্যক্ষ সিরাজ পানের পিক ফেলে ঝুড়িতে। জর্দার কড়া গন্ধ এসে লাগে নাকে। নুসরাতের গা গুলিয়ে উঠে। বমি পায়।

'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে নুসরাত। সেই ফাস্ট ইয়ার থেকে।'

'স্যার এগুলান কী বলেন আপনি। আপনি আমার আব্বার মতো। আমি তার মতো আপনেরে সম্মান করি।'

সিরাজ এগিয়ে আসে। নুসরাতের কাঁধে হাত রাখার চেষ্টা করে। নুসরাত সরে যায়। সিরাজ আরো এগিয়ে যায়। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলে নুসরাত কেঁদে মেঝেতে বসে পড়ে। কাঁদতে থাকে। সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

'পোলাপানের সাথে প্রেম করে কি পাইবা? কিছুই না' নিজেই বলে সিরাজ। নুসরাত চুপ থাকে।

'আমার কথামতো চলো। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিয়া দিমু।' নুসরাত তবুও উত্তর করে না। মেজাজ চড়তে থাকে সিরাজের। একটু ভয় ভয়ও করে। এর আগে কতো ছাত্রীকে সে এমন করে ভোগ করেছে কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পায়নি। সাহস করবেই বা কেন? এলাকার রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসন সবই তার কেনা। কোন না কোনভাবে সে তাদের উপকারে এসেছে। আগের মাদরাসা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে শিক্ষা নিয়েছে ম্যানেজিং কমিটিকে ম্যানেজ করে চলতে হবে। সবকিছু তার ম্যানেজে, কিন্তু কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করেও নুসরাতকে সে বশে আনতে পারছে না। মেয়েটার মধ্যে একটা গোখরা সাপের মতো ফনা রয়েছে। ফনা নামানোর মতো ওঝা সে হতে পারছে না। নানাভাবে অপবাদ দিয়ে তাকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু কিছুতেই সে দমবার পাত্র নয়। রূপের তেজের সাথে সাথে যেন দৃঢ় হচ্ছে সে। আবারো নুসরাতকে সে আহ্বান জানায়। নুসরাত প্রতিবাদ করে। কিছুক্ষণ পর অধ্যক্ষ কলবেল চাপে। নুসরাত মেঝেতে মাথা নিচু করে বসে আছে। নুরুল আমিন তাকে বের করে আনেন। বাইরে এসেই নুসরাত অপেক্ষায় থাকা বান্ধবী নিশাত আর তনিকে দেখে কাঁদতে শুরু করে। বাড়িতে এসে সব ঘটনা খুলে বলে মাকে। মা শিরিন আক্তার সাহস দেন মেয়েকে। তিনি নুসরাতকে সাথে নিয়ে সরাসরি চলে যান অধ্যক্ষ সিরাজের কক্ষে। অধ্যক্ষ নুসরাতসহ মাকে দেখে একটু ভড়কে যায়। কিন্তু ওপরে সিনা টান টান করে রাখে। বলে,

'তুমি কোন সাহসে এখানে ঢুকেছ? এটা অফিস।' এ কথা বলেই অধ্যক্ষ কোথাও ফোন করে। কিছুক্ষণের মধ্যে থানার এসআই ইকবাল হাজির হন। অধ্যক্ষ পুলিশকে বলে, 'ওরা হাঙ্গামা করছে নাটক সাজিয়ে।' এরপর এস আই নুসরাতকে উল্টাপাল্টা জেরা করতে শুরু করেন। এমন সব কথা বলতে থাকেন যা যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে। একপর্যায়ে নুসরাত অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তা নির্বিকার। বলেন, 'এমন কিছু হয়নি যে বেহুঁশ হয়ে যেতে হবে।' নুসরাত ডায়রিতে লিখেছে, 'আমি লড়ব শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত। প্রথমে যে ভুলটা করেছি আত্মহত্যা করতে গিয়ে, সেই ভুলটা দ্বিতীয়বার করব না। মরে যাওয়া মানেই তো হেরে যাওয়া। আমি মরব না। আমি বাঁচব। আমি তাকে শাস্তি দেব, যে আমায় কষ্ট দিয়েছে। আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যে তাকে দেখে অন্যরা শিক্ষা নেবে।' তার মানে নুসরাতের সাথে এমন ঘটনা নতুন নয়। তাকে আরো একবার বা বহুবার এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

শিরিন আক্তার মেয়েকে নিয়ে মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছে যান, সহ-সভাপতির কাছে যান। তারা নানা তালবাহানা করে ঘটনা ধামাচাপা দিতে চান। নুসরাত সাহস করে তার বান্ধবীকে নিয়ে থানায় যায়। ওসি নুসরাতের কথাকে প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেন। পরে তিনি আরেক দফা মৌখিকভাবে যৌন হেনস্থা করেন। নুসরাতের নেকাব খুলে তার বলা কথাগুলো ভিডিও করেন। সেখানে উপস্থিত পৌর মেয়র এমন কাজ করতে নিষেধ করলেও তিনি শোনেন না। নুসরাতের কান্নাকে ব্যাঙ্গ করে ওসি বলেন,

'এমন কিছু হয়নি যে তোমাকে এখনি কাঁদতে হবে।' নুসরাত মুখ ঢেকে কাঁদে।

'তোমার বুকে হাত দিয়েছে? তুমি নিজে গেছিলা না অধ্যক্ষের কাছে?'

'না, আমাকে ডাকায় নিছে। স্যার ভিডিও কইরেন না।'

'কেউ দেখবে না এই ভিডিও। শুধু আমি জানবো।'

'স্যার তারপরও স্যার। আমার অভিযোগ নেন আপনি।'

'কিছু হয় নাই, তুমি রাখো আমি দেখতেছি।' নুসরাত বেরিয়ে যায়। কিন্তু সে বিষয়টি জানায় সংবাদকর্মীদের। তার ঘনিষ্ঠদের। চারদিক থেকে

একটা প্রতিবাদের রব উঠে। অধ্যক্ষ সিরাজের বিরুদ্ধে মামলা নিতে বাধ্য হয় পুলিশ। নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেফতার করা হয় তাকে। আপাতত নুসরাতের মনে শান্তি ফিরে আসে। সেদিন সে মায়ের কাছে নানা কিছু খাবার আবদার করে। ছোট ভাইকে দিয়ে বাজার থেকে চকলেট এনে খায়। সামনে পরীক্ষা তাই মনটাকে ফুরফুরে করার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু নেচেও নেয় একাকী। কিন্তু পরদিন দেখা যায় ঘটনা অন্য।

তিন.

অধ্যক্ষ সিরাজ উদদৌলার মুক্তির দাবিতে 'সিরাজ উদদৌলা সাহেবের মুক্তি পরিষদ' নামে কমিটি গঠন করা হলো। ২০ সদস্যের এ কমিটির আহ্বায়ক মাদরাসার সাবেক ছাত্র নূর উদ্দিন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাতের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত শাহাদাত হোসেন। উপজেলা সদরে দুই দফা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করা হয় তাদের নেতৃত্বে। অবশ্য মানববন্ধনে অনেকে এসেছেন চাপে পড়ে। বিশেষ করে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা। কিন্তু নুসরাতের খারাপ লেগেছে তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বান্ধবীকে সেখানে দেখে। তাদের উদ্দেশ্য করে পরে নুসরাত ডায়রিতে লিখেছে, 'তামান্না, সাথী। তোরা আমার বোনের মতো এবং বোনই। ওই দিন তামান্না আমায় বলেছিল, আমি নাকি নাটক করতেছি। তোর সামনেই বলল। আরও কী কী বলল। আর তুই নাকি নিশাতকে বলেছিলি, আমরা খারাপ মেয়ে। বোন, প্রেম করলে কি সে খারাপ? তোরা সিরাজ উদদৌলা সম্পর্কে সব জানার পরও কীভাবে তার মুক্তি চাইতেছিস? ওনি আমার কোন জায়গায় হাত দিয়েছে আর কোন জায়গায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করছে, উনি আমায় বলতেছে, নুসরাত ঢং করিস না। তুই প্রেম করিস না। ছেলেদের সাথে প্রেম করতে ভালো লাগে। ওরা তোরে কী দিতে পারবে? আমি তোরে পরীক্ষার সময় প্রশ্ন দেব।'

সিরাজ মুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে। মামলা তুলে নিতে হুমকিও দেয়া হয় নুসরাতের পরিবারকে। ওই দিনই নূর উদ্দিন, শাহাদাত ফেনী কারাগারে সিরাজ উদদৌলার সঙ্গে দেখা করে। সিরাজ তাদের বলে, 'হুজুরের জন্য কিছু কর। প্রয়োজনে নুসরাতকে সরিয়ে দেয়।' সেই আদেশ নিয়েই রাতে বৈঠক হয় বটতলা থেকে অদূরে খোলা মাঠে। সেখানে ছিল সিরাজের ঘনিষ্ঠ দশ জন। পরিকল্পনা হয় নুসরাতকে আরবি প্রথম পত্র পরীক্ষার দিন হত্যা করা হবে। সেটিকে চালিয়ে দেয়া হবে আত্মহত্যা বলে। থানা পুলিশের বিষয়টি দেখবে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। চারজন থাকবে মূল কাজে। না চেনার জন্য সবাইকে বোরকা পরতে হবে। মাদরাসা এবং এর আশপাশে কারা পাহারায় থাকবে সে সিদ্ধান্তও হয়। একজন নারী সোনাগাজী বাজারের মানিক প্লাজা থেকে এক হাজার নয়শো আশি টাকা দিয়ে দুটো কালো বোরকা কেনে। দোকানদার দরধাম না করাতে একটু অবাক হলেও বেচতে পেরে কিছু বলেন না। এরপর বড় মসজিদের কাছের ফুটপাতের দোকান থেকে কেনা হয় কালো রঙের চার জোড়া হাতমোজা। তিনি সেগুলো পরিকল্পনা মতো দু'জনকে হস্তান্তর করে।

এমনিতে কয়েকদিনের ঘটনায় নুসরাত একটু বিক্ষিপ্ত। ভেবেছিল সিরাজ গ্রেফতার হওয়ার পর সবকিছু মিটে যাবে কিন্তু ঝামেলা আরো বাড়ছে। তবুও নুসরাত এর শেষ দেখে ছাড়বে। প্রথম দিনের পরীক্ষা তাই বেশ রাত জেগে পড়াশোনা করে সে। সকালে পরীক্ষা দিতেও যায় আগেভাগেই। মা শিরিন আক্তার গরম ভাত রান্না করলেও সকালে সেদিন কী মনে করে পান্তা ভাত খায়। কিন্তু পথে যেতে স্বভাবসুলভ দুষ্টুমি করে না। তাছাড়া সাথে ছোট ভাই রয়েছে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার পর থেকে বাবা-মা একা ছাড়তে রাজি নন। গেইটেই ভাইকে আটকে দেয় প্রহরি। সেটাই অবশ্য নিয়ম। পরীক্ষার হল বলে কথা। কিন্তু রুমে ঢুকতে না ঢুকতেই এক মেয়ে এসে বললো তার বান্ধবী নিশাতকে কারা যেন মারছে। প্রিয় বান্ধবীর এমন অবস্থায় ছুটে যায় নুসরাত। ভাবারও সময় নেয় না যে তাকে ডাকতে এসেছে সে কে? বোরকা পরা মেয়েটির পেছন পেছন তিন তলার ছাদে যায় নুসরাত। এর মধ্যে একজন এসে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে তাতে নুসরাতকে সই দিতে বলে। বলা হয় অধক্ষ্যের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে। কিন্তু অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিতে নুসরাত রাজি হয় না। আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঘাতকরা। একজন তার গা থেকে ওড়না খুলে তা আরেকজনের হাতে দেয়। সে ওড়না লম্বালম্বি দুই টুকরো করে ফেলে। একজন নুসরতের মুখ চেপে ধরে। সবার পরনে বোরখা থাকায় কাউকে চিনতে পারছে না নুসরাত। একজন নুসরাতের দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধে। নুসরাত চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু শব্দ বের হয় না। গর্‌গর্‌ আওয়াজ মিশে যায় পরীক্ষা শুরুর আগে সমন্বিত প্রস্তুতির ধ্বনির মাঝে। নুসরাতকে মেঝেতে ফেলে দেয়া হয়। পা ধরে ওড়না দিয়ে একজন বেঁধে ফেলে। অপর একজনকে বুক চেপে ধরতে বললে সে রাজি হয় না। কারণ তার পেটে বাচ্চা রয়েছে। এতে নির্দেশদাতার রাগ হয়। কথা না শুনলে লাথি মেরে পেটের বাচ্চার ক্ষতি করার হুমকি দেয় সে। এরপর ওই বোরকা পরা মেয়ে পা চেপে ধরে। সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নুসরাত চেষ্টা করে ছুটতে। কিন্তু পারে না। একজন পলিব্যাগে থাকা কেরোসিন ছিটিয়ে দেয় নুসরাতের গায়ে। ইশারায় অপরজনকে বলে গায়ে আগুন দিতে। নুসরাতের চোখ বেরিয়ে আসতে চায়। সব দেখছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না, কাউকে চিনতেও পারছে না বোরকা আর নেকাবের কারণে। ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠি ছুটে আসে নুসরাতের শরীরে। একজন ভয় পেয়ে দূরে চলে যায়। আরেকজন দৌড়ে নিচে নামে পরীক্ষা দিতে। নামার সময় সে চম্পা নামে ডাক দেয়। এটি আগের প্লানের অংশ। নুসরাতকে ছেড়ে দিয়ে বলে 'এবার পালা'। নুসরাত আগুন লাগা অবস্থায় ছুটতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে। খুনিদের একজন টয়লেট দিয়ে পালিয়ে যায়। আরেকজন ঢুকে পড়ে মাদরাসা হোস্টেলে। একজন নিরাপত্তা প্রহরি নুসরাতকে দেখে ছুটে আসেন। একে একে সবাই জড়ো হতে থাকে। দ্রুত নেয়া হয় উপজেলা হাসপাতালে। তারপর সদর। অবস্থার অবনতি হলে নেয়া হয় ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে। সেখানেই পথে অ্যাম্বুলেন্সে ভাইকে নুসরাত বলে যায় ঘটনার কথা। যা পরে ফেসবুকে ভাইরাল হয়। সেটিই এসে ইনবক্সে জমা হয় পাহাড়ি মামুর কাছে।

> 'পোলাপানের সাথে প্রেম করে কি পাইবা? কিছুই না' নিজেই বলে সিরাজ। নুসরাত চুপ থাকে। 'আমার কথামতো চলো। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিয়া দিমু।' নুসরাত তবুও উত্তর করে না। মেজাজ চড়তে থাকে সিরাজের। একটু ভয় ভয়ও করে। এর আগে কতো ছাত্রীকে সে এমন করে ভোগ করেছে কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পায়নি। সাহস করবেই বা কেন? এলাকার রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসন সবই তার কেনা। কোন না কোনভাবে সে তাদের উপকারে এসেছে। আগের মাদরাসা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে শিক্ষা নিয়েছে ম্যানেজিং কমিটিকে ম্যানেজ করে চলতে হবে

চার.

ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সাংবাদিকরা।

ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় শুরু হয়েছে। যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে শুভবোধের মানুষগুলো বিচারের দাবিতে বিক্ষোভও করেছে। সোনাগাজী থানার ওসির বক্তব্য নিতে গিয়েছিলেন সেখানকার সাংবাদিকরা। তিনি বলেছেন, 'ঘটনাটি হত্যা না আত্মহত্যা সেটি তদন্ত করে বলতে হবে।' এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয়েছে মারাত্মক। বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক সামন্ত লাল সেন জানালেন, নুসরাতের শরীরের ৭৫ ভাগ পুড়ে গেছে। আপাতত তিনি কোনো সুখবর দিতে পারলেন না। প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে। বিকেলের দিকে টনক নড়তে শুরু করেছে ঢাকার প্রশাসনেরও। সরকারপ্রধান নুসরাতের চিকিৎসায় যেন কোনো ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ ইতোমধ্যে জেনে গেছে নুসরাতের শরীরে আগুন দেয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। নুসরাতের পরিবার স্থানীয় প্রশাসনের ওপর যে আস্থা রাখতে পারছেন না সেটা জানিয়ে দিয়েছে সাংবাদিকদের মাধ্যমে। পরদিন নুসরাতের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো সিদ্ধান্ত হলেও অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় পাঠানো যাচ্ছে না। সেদিন দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। পরদিন পুলিশ মামুর হেড ফিরেন বিদেশ থেকে। আইজিপির নির্দেশে মামলার তদন্ত হস্তান্তর করা হয় তাদের কাছে। হেডের প্রিয়পাত্র হিসেবে ডাক পড়ে পাহাড়ি মামুর। তিনি জানতেন সেটা। তাই তৈরিই ছিলেন। তদন্তে নেমেই প্রথমে হেডের নির্দেশে তাদের প্রতিটি ইউনিটকে আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় করা হলো। কারো খবর কারো কাছে নেই। ইউটিউবে নুসরাতের যে বক্তব্য সেটি আসলেই তার কি-না জানার জন্য দু'জন নারী কর্মকর্তাকে পাঠানো হলো বার্ন ইউনিটে। রোগীর সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে তারা তেমন কোনো তথ্য দিতে পারলেন না। ফেনীতে পাঠানো হলো ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া নুসরাতের চিঠি তার কি-না পর্যবেক্ষণ করতে। সেগুলো তার বলে প্রমাণ হলো। হেডের নির্দেশেই সব কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। পাহাড়ি মামু এরই মধ্যে ওসির ধারণ করা নুসরাতের বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন। আরো দুটি বিষয় দ্রুত এগুচ্ছে। প্রথমটি সারাদেশের মানুষ একযোগে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আর অপর দিকে নুসরাতের অবস্থার ক্রমাবনতি হচ্ছে। পাহাড়ি কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে হেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার কাজ এগুচ্ছেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে ফেনী কারাগারে দেখা করলো কারা। তার পক্ষে মানববন্ধন করলো কারা। তার স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলা দরকার। আরেকটি বিষয় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তার। স্থানীয় প্রশাসনের মতে বা অধ্যক্ষের পক্ষের লোকজন বলছে নুসরাত আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু নুসরাত যদি নিজের শরীরে আগুন দিয়ে থাকে তাহলে সে বাঁচতে চাইবে কেনো? আর পরীক্ষার হলে কেরোসিন নিয়ে যেতে পারার কথা নয়। তাহলে ধরে নিতে হবে তাকে যদি আগুন লাগিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে ভেতরে থাকা কেউ জড়িত থাকতে পারে। বিষয়গুলো তিনি হেডকে জানালেন। নির্দেশ এলো ঘটনাস্থলে যাবার। কিন্তু সেদিন রাতেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরো একটি দুঃসংবাদ। রাত সাড়ে নয়টার দিকে টিভির স্ক্রলে লাল লেখায় ভেসে উঠে 'মারা গেলেন নুসরাত জাহান রাফি'। মা শিরিন আক্তার মৃত্যু সংবাদ শুনে জ্ঞান হারান।

পাঁচ

গোয়েন্দাদের আবেগ বেশি থাকলে চলে না। তাদের চলতে হয় বেগ দিয়ে। কানা গলি ঘুপচির অন্ধকার মাড়িয়ে। তাই হতে হয় কৌশলীও। নুসরাতের মৃত্যু পাহাড়ি মামুকে আবেগী করলেও তিনি সেটার প্রকাশ ঘটাননি। পরদিন ভোর না হতেই ছুটে গেছেন ফেনীতে ঘটনাস্থলে। সেখানে ইতোমধ্যে সন্দেহভাজন কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের সাথে কথা বললেন পাহাড়ি। বুঝলেন এদের বেশিরভাগেরই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই। দু'একজন আছেন অধ্যক্ষের পক্ষের লোক। আর বাকিরা নুসরাতকে কোনো কারণে পছন্দ করতো না। পাহাড়ি কথা বললেন নিরাপত্তা প্রহরির সাথে। তিনি অধ্যক্ষের অপকর্মের কথা জানলেও নুসরাতের হত্যার পেছনে কারা জড়িত সেটা বুঝতে পারছেন না। তার একটা কথা বেশ মজার মনে হলো। 'সবাইতো বোরখা, হাতমোজা আর নেকাব পরেই মাদরাসায় ঢুকে কাজেই চেনা মুশকিল।' নুসরাতের খালাতো বোন বললেন তার জানা সবকিছু। অধ্যক্ষের স্ত্রীর সাথে কথা বললেন পাহাড়ি। সবশেষ এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে তিনি অফিসিয়ালি নিশ্চিত হলেন নুসরাতকে হত্যার উদ্দেশ্যেই আগুন দেয়া হয়েছে। কিন্তু কারা করেছে এই কাজ। সবকিছু জানানো হলো হেডকে। তার নির্দেশে সোর্স বাড়ানো হলো এলাকায়। নানাজনকে ভয়ভীতিও দেখানো হলো। ইতোমধ্যে অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। অভিজ্ঞতা বলে, সেটা যে কোনো ঘটনা ঘটলে হয়ে থাকে। তবে সবার এক কথা নূর উদ্দিনকে ধরতে পারলে অনেক তথ্যই জানা যাবে। কে এই নূর উদ্দিন। পত্রিকার পাতায় ইতোমধ্যে তার ছবি বেরিয়েছে। সিরাজের পক্ষে মানববন্ধনে সে ছিল আহ্বায়ক। বাড়িতে গিয়ে নূর উদ্দিনকে পাওয়া গেলো না। ঘটনার পরদিন থেকে সে মোবাইল বন্ধ করে পালিয়েছে। হেড এর নির্দেশে সারাদেশের প্রতিটি টিম সচল হয়ে উঠলো। নূর উদ্দিনের সন্ধানে সবাই উঠে পড়ে লাগলো। কারণ সিরাজের কারণে কোনো অনুমতি ছাড়াই সে মাদরাসায় ঢুকতে পারত। নূর উদ্দিনের ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেলো প্রায় তিন বছর আগে সে ময়মনসিংহের ভালুকায় গিয়েছিল। সেখানে তার সাথে এক লোকের সেলফি রয়েছে। বিষয়টি হেডই প্রথমে জানালো পাহাড়ি মামুকে। পাহাড়ি সেই ছবি এলাকাবাসীকে দেখিয়েছে। তার নাম আকবর। সে ফেনীর লোক হলেও ময়মনসিংহের ভালুকায় থাকে। হেডের নির্দেশে পাহাড়ি মামুর টিম ভালুকা চষে বেড়াচ্ছে গোপনে। আলাদাভাবে আরো কয়েকটি টিম কাজ করছে। কিন্তু ঠিক কোথায় আকবর থাকে সেটি জানা যাচ্ছিল না। অবশেষে হবিরবাড়ি ইউনিয়নের আমতলীর শহীদুলকে পাওয়া গেলো যিনি আকবরকে চিনেন। শহীদুল এসেছিলেন বাজারে পান কিনতে। সাধারণ পোশাকে কিছু লোক তাকে জেরা করছে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। গড়গড় করে বলেছেন, আকবরকে তিনি দেখেছেন, কিন্তু নূর উদ্দিনকে তিনি দেখেননি। যদি সংবাদপত্র পড়া বা টিভিতে সংবাদ দেখার অভ্যাস থাকতো তাহলে হয়তো চোখে পড়তো।

শহীদুলের সাথে কথা শেষ হতে না হতেই গোয়েন্দা টিম পৌঁছে গেলো আকবরের বাসায়। আকবরকে পাওয়া গেলো না। হয়তো পালিয়েছে। কিন্তু একটা কক্ষে পাওয়া গেলো নূরকে। তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এর মধ্যে অস্ত্রসহ এতগুলো লোকের উপস্থিতি তাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। ঘুম ছুটে গেছে দ্রুত। ওই অবস্থায় তাকে তোলা হলো সাদা মাইক্রোবাসে। পাহাড়ি মামু দ্রুত সংবাদ জানিয়ে দেয় হেডকে। ততক্ষণে সংবাদ মাধ্যমও জেনে যায়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে মাইক্রোবাসে খানিকটা পথ যাওয়ার পর। নূর কাপড় চোপড় নষ্ট করে ফেলেছে। গাড়ি একপাশে থামিয়ে পুরোনো ময়লা লুঙ্গি পরার সুযোগ দেয়া হলো তাকে। কোনোমতে গাড়ি পরিষ্কার করে আবারও নূরকে নিয়ে রওনা হেড কোয়ার্টারের দিকে।

নূরকে পাওয়া মানেই বলা যেতে পারে সমস্যার অনেকটাই সমাধান। তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের কায়দাটাও ছিল ভিন্ন। সেটা আর পাহাড়ি মামু বিস্তারিত বললেন না। সেদিনই আটক করা হয় ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে শাহাদাতকে। সন্দেহভাজন জাবেদ, পপি ও মণির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল আগে থেকেই। কাজেই তাদের আটক করতে বেশি সময় লাগেনি। আপাতত প্রাথমিক কাজ শেষে গোয়েন্দা কর্মকর্তা পাহাড়ি মামু ফিরছিলেন ফেনী থেকে। কিছুটা স্বস্তি লাগছে তার। ক্লুহীন একটি ঘটনার সমাধান বলবে হয়তো অনেকে। কিন্তু হত্যাকারী কোনো না কোনোভাবেই ক্লু রেখে যায়। আর সেটাই ধরা পড়ে অভিজ্ঞদের কাছে। মনে মনে হেডকে স্যালুট জানান তিনি। এই যে তাদের দৃষ্টিতে যারা জড়িত বলে প্রমাণ হয়েছে বা আটক করা হয়েছে এদের অনেকেই নুসরাতের জানাজায় অংশ নিয়েছে। তবে তার একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে, কীসের স্বার্থে তারা নুসরাতকে পুড়িয়ে মারলো। এরাতো কেউ পেশাদার খুনি নয়, কিন্তু আচরণ করেছে পেশাদারের মতো। বোরকা কিনেছে, ঘটনা সাজিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় নুসরাতের দুই সহপাঠী মণি ও পপি এতবড় ঘটনার পরও ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষা দিয়েছে। এক লম্পট মাদরাসা অধ্যক্ষের কারণে কতগুলো জীবন নষ্ট হয়ে গেলো। হাইওয়ে রোডে হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। গাড়িতে গান চলছে চিরকুটের। 'পারলা দয়াল পারলা, এই মরারেই মারলা'। না, নুসরাতের মৃত্যু হয়েছে হয়তো শারীরিকভাবে। কিন্তু সে যে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো তাতো সহজেই নিভবে না। ৯০

(গল্পটি বাস্তব ও কল্পনার মিশেল)